একজন পলাতকের বিজয় ভাবনা

প্রদীপ দেব

১

আমার এক বন্ধু মাঝে মাঝে বাংলাদেশ থেকে ফোন করে আমাকে ভীষণ গালিগালাজ করে। এমনিতেই তার মুখের ভাষায় কোন ট্রাফিক লাইট নেই, তদুপরি গালিগালাজ করার উদ্দেশ্যেই যখন ফোন করে - তখন তা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় তা বলাই বাহুল্য। মেজাজ খারাপ থাকলে তার কথায় রাগ করি, ফোন রেখে দিই। পরে অনুশোচনা করি, ফোনে তাকে আবার পাবার চেষ্টা করি। এটা মোটামুটি নিয়মিত ব্যাপার। তার অনেক কথা আমার কাছে যুক্তিহীন মনে হয়, কিন্তু কিছু কিছু কথা ঠিক উড়িয়ে দিতে পারি না। সে আমার নাম দিয়েছে পলাতক। শুধু আমি নই, আমরা যারা পড়ালেখা করার নামে দেশের বাইরে এসে আর ফিরে যাইনি - সবাই নাকি পলাতক। যুদ্ধ না করে পালিয়ে গেছি দেশ থেকে - এটাই তার যুক্তি। আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের যতগুলো যুক্তি আছে - তার কোনটাই কাজ করে না তার কাছে। সে মনে করে বাংলাদেশের যেসব শ্রমিক দেশের বাইরে কাজ করতে যান - তাঁরা অনেক বেশি দেশপ্রেমিক - আমাদের চেয়ে। তাঁরা সারাজীবন দেশের বাইরে থাকলেও দেশেরই থাকেন। আর আমরা - দুদিন দেশান্তরী হয়েই চিরদিনের জন্য দেশ ছাড়ি। আমি বোঝাতে চাই আমার বন্ধুকে, আমরাও কি দেশেরই থাকি না? চিরদিন? ভৌগোলিক দূরত্বই কি সব? যারা দেশের ভেতরে আছেন - তাঁরা সবাই কি আসলেই দেশের? বাংলাদেশের? মননে? চেতনায়? কর্মে? সে আমাকে মারাত্মক গালি দিয়ে থামিয়ে দেয়। আমি শেষ চেষ্টা করে বলি - দেশে থেকে নিত্য দিন শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করলেই কি দেশের বিরাট লাভ হয়ে যাবে? এ যুদ্ধে তো জেতার কোন সম্ভাবনা নেই। আমার বন্ধুটি বলে, নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যে পালিয়ে না গিয়ে যুদ্ধ করে সে-ই তো সংশপ্তক। আমি সংশপ্তক নই, কিন্তু আমার এই সংশপ্তক বন্ধুটিকে বড় ভালোবাসি, ঈর্ষা করি এবং নিজেকে আমি সত্যিই পলাতক মনে করতে থাকি।

২

প্রযুক্তির কল্যাণে ইন্টারনেট টেলিভিশনে জেগে ওঠে বাংলাদেশের বিজয় দিবসের উৎসব। দৃশ্যগুলো আমাকে একই সাথে সুখি ও অসুখি করে দেয়। একটা প্রশ্ন কাঁটার মত আমাকে বিঁধতে থাকে। স্বাধীনতা

দিবসে - বিজয় দিবসের উৎসবে বিভিন্ন দলের নেতা উপনেতা পাতিনেতারা যে একাত্তরে আমাদের বিজয় হয়েছে বলে দাবী করেন - তা কতটুকু সঠিক? মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি কি আসলেই জিতেছে? যদি তাই হবে তাহলে সে বিজয়ের স্থায়ীত্ব কতদিনের? সে বিজয়ের কিছুই কি অবশিষ্ট আছে আজ? বিজয় অর্জনের চার বছরের মধ্যেই জাতির পিতাকে সপরিবারে নৃশংস ভাবে খুন করা হলো। যারা খুন করেছে - তারা তো সবাই বাংলাদেশী! তারা তো পুনর্বাসিত হয়েছে দেশেই। খুনিদের কেউ কেউ সংসদের বিরোধীদলীয় নেতাও হয়েছে কিছু সময়ের জন্য। একাত্তরের চিহ্নিত রাজাকার আল্‌বদর বাহিনীর নেতা বলে আমরা যাদের জানি - তাঁরা তো এখন বাংলাদেশের জাতীয় নেতা। তাঁরা বাংলাদেশের মন্ত্রী হয়েছেন, তাঁদের গাড়িতে উড়েছে বাংলাদেশের পতাকা। আমরা আসলে কীসের ভিত্তিতে বলি যে আমরাই জিতেছি? মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি? বর্তমান বাংলাদেশের এমন কোন পর্যায় কি আছে যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা শক্তিশালী? নতুন প্রজন্মের ঠিক কজন ছেলেমেয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ? আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটাই কি পরিষ্কার আমাদের কাছে?

হুমায়ূন আজাদ বলেছেন, একজন রাজাকার চিরদিনই রাজাকার, কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা চিরদিন মুক্তিযোদ্ধা নন। তা তো আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। রাজনীতির নিয়মে নাকি একজন মুক্তিযোদ্ধারও এক ভোট, একজন রাজাকারেরও এক ভোট। সুতরাং বিভাজনের নাকি দরকার নেই। অনেক জাঁদরেল মুক্তিযোদ্ধার মুখে শোনা গেছে একথা। তাহলে ঘটা করে বিজয় দিবস পালন করে আমরা আসলে কী প্রমাণ করতে চাই? আমার মনে হয় - আমরা একাত্তরের বিজয়ের স্মৃতিটুকু সম্বল করেই বেঁচে থাকতে চাই - কারণ ওটা ছাড়া আমাদের আর কোন অর্জন নেই এই পঁয়ত্রিশ বছরে। আমরা পঁয়ত্রিশ বছর একাত্তরের স্মৃতিচারণ করেই কাটিয়ে দিলাম। আর রাজাকাররা আমাদের চোখের সামনে আমাদের প্রশ্রয়ে আমাদের রক্তেই পুষ্ট হয়েছে দিনের পর দিন। সেদিনের পরাজয়ের প্রতিশোধ তারা নিয়েই চলেছে। কিছুদিন পরে আমাদের পরের প্রজন্ম বিশ্বাসই করবে না যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কীরকম নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে ত্রিশ লক্ষ মানুষকে। জামায়াত শিবির এখন প্রকাশ্যে একটি দল - কিন্তু অদৃশ্য ভাইরাসের মত তারা ঢুকে গেছে অন্যদলগুলোর ছায়াতেও। এমন কি যারা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় এনেছে বলে দাবী করে তাদের আস্তিনেও। কিছুদিন পরে বিজয় দিবস পালন করবে তারাই - যারা একদিন পরাজিত হয়েছিলো।

৩

আঠারো ডিসেম্বরের প্রথম আলোর একটি খবরে শিউরে উঠেছি। সুনামগঞ্জের ছাতকের একটি গ্রামে একজন মুক্তিযোদ্ধার গলায় জুতার মালা পরিয়ে এলাকার মসজিদের চারপাশে ঘোরানো হয়েছে। আর

গ্রামবাসীরা তা সোল্লাসে উপভোগ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাটি ভিক্ষা করে সংসার চালান। তাঁর অপরাধ - তাঁর মেয়ের সাথে লালা মিয়া নামে গ্রামের একজন প্রভাবশালী লোক বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এ সম্পর্কের ফলে মুক্তিযোদ্ধার মেয়েটি একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় - দুদিন পরে শিশুটি মারা যায়। জাউয়া বাজার মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুফ্‌তি আবদুস সোবহান ফতোয়া দেন - মেয়েটিই দোষী। তার বাবা যেহেতু মুক্তিযোদ্ধা - সেহেতু তাকে জুতার মালা পরিয়ে গ্রামের বা মসজিদের চারপাশে ঘোরানো হোক। আর মেয়েটিকে ১১টি বেত একত্র করে সবার সামনে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হোক। বাবাকে জুতার মালা পরিয়ে মসজিদের চারপাশে ঘুরানো হয়েছে। গ্রামবাসী আনন্দ সহকারে উপভোগ করেছে এ দৃশ্য। সবার সামনে মেয়েটিকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হবে - এ নৃশংস দৃশ্য দেখার জন্যও তাদের লোভ হয়েছে নিশ্চয়। যে লালা মিয়ার কারণে মেয়েটির এ অবস্থা - সে লালা মিয়া কিন্তু দিব্যি আছে। সে নাকি মেয়েটিকে বিয়ে করতেই চাচ্ছিলো - কিন্তু তার প্রথম স্ত্রী অনুমতি দিচ্ছে না। কী চমৎকার সৎ মানুষ!! মেয়েটির শরীর চাওয়ার সময় নিশ্চয় প্রথম স্ত্রী অনুমতি দিয়েছিলো!

গণমাধ্যমের কারণে মেয়েটির প্রকাশ্য শাস্তি শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। কাউকে কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্তই। এরকম ঘটনা বাংলাদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা কীরকম অবস্থায় আছে স্বাধীন বাংলাদেশে - এ ঘটনা তার একটি সাধারণ উদাহরণ।

৪

অন্যায় ঘটবে এটাই যেন স্বাভাবিক। মেয়েটির ওপর অন্যায় শাস্তি সাময়িক ভাবে প্রতিহত করা গেছে - এটাকেই হয়তো আমরা আমাদের বিজয় মনে করবো। আমরা ভাববো এরচেয়ে খারাপও তো হতে পারতো। কয়েকজন চুনোপুটি ধরা হয়েছে তাতেই আমরা খুশি হয়ে যাবো। আর মুফ্‌তি আবদুস সোবহানরা ফতোয়া দিয়েই যাবেন বাংলাদেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। সে ফতোয়া কার্যকর করা হবে প্রশাসনের নাকের ডগায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রশাসনেরই ছত্রছায়ায়। তারপরও আশা থাকে। থাকতে হয় কোথাও না কোথাও। নইলে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেলে তো বাঁচা সম্ভব নয়। বাঁচার আশাতেই প্রতিদিন সংগ্রাম করছে আমার দেশের সংশপ্তক মানুষ।

২০ ডিসেম্বর, ২০০৬

ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া